প্রেত

অনীশ দাস অপু

www.banglabookpdf.blogspot.com



অনেকক্ষণ ধরে কলিংবেল বাজছে। লক্ষ করেছি, আমি যখন কোন কাজে ব্যস্ত থাকি ঠিক তখনই হয় কলিংবেল, না হয় টেলিফোন বাজতে থাকে। সেই শব্দে আর কাউকে ব্যস্ত হতে দেখা যায় না। অথচ বাসায় আমার স্ত্রী রুবা আছে, দশ-এগারো বছরের একটি কাজের ছেলে আছে–গিল্টু মিয়া। রুবা অবশ্য তার এই ভয়াবহ নাম পাল্টে রেখেছে অনীক। সংক্ষেপে অনি। যে কোন সামান্য বিষয় নিয়ে আহ্লাদ করার ক্ষমতা রুবার অসাধারণ। এই নাম নিয়েও তার আহ্লাদ কম না। তার আবার টেলিফোন ম্যানিয়াও আছে। টেলিফোন ধরলেই নাকি গা শিরশির করে, মাথা ঘোরে। কিন্তু কলিংবেলের শব্দে কেউ দরজা খুলবে না, এটা কেমন কথা?

বিরক্ত হয়ে আমিই উঠলাম দরজা খুলে দেওয়ার জন্য। দরজা খুলে বিরক্তি আরও বাড়ল। নিতান্তই অপরিচিত এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ছোট সাইজের একটা ব্রিফকেস। পরনে কালো প্যান্ট এবং হালকা ঘিয়া রঙের সার্ট। চোখে গোল্ডরিমের চশমা। মুখে দু'এক দিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

আগন্তুক হাসিমুখে বলল, 'কী রে শালা। কেমন আছিস…?'

সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেললাম–কী আশ্চর্য! হাসান দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। আমার স্কুল এবং কলেজ লাইফের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। একমাত্র ওই আমার নামটা সংক্ষেপ করে নিয়ে 'শালা' বলে ডাকত। কারণ আমার নাম ছিল, মোঃ সাইখ আল লাইজ ইবনে ইসলাম। এই বিচিত্র নাম রেখেছিলেন আমার দাদাজান। এর অর্থ আমি আজও জানি না। হাসান মাঝে মাঝে খেপাত, 'শালা তোর নামটা, "সাইখ" না হয়ে "শাইখ" হলে ভাল হত। শালা ডাকটা বিশুদ্ধ হত।'

সেই হাসান আমার সামনে দাঁড়িয়ে। বিশ্বাসই হচ্ছে না। কত পরিবর্তন হয়েছে চেহারার! শুধু সেই পরিচিত ডাক আর হাসি না হলে হয়তো চিনতেই পারতাম না। কলেজ থেকে বের হওয়ার পর থেকে ওর সাথে আমার আর কোন যোগাযোগই ছিল না। যতদূর শুনেছিলাম, সিলেট মেডিকেলে চান্স পেয়েছিল।

'কী রে! ঢুকতে দিবি না?'

ওর কথায় চমক ভাঙল। হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে এসে সোফায় বসালাম। আর ঠিক তখুনি আমার মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি হলো। মনে হলো, আমি যেন অসীম অনন্ত এক গহ্বরে পড়ে যাচ্ছি। এই পতনের কোন শেষ নেই। চমকে উঠে ওর হাত ছেড়ে দিলাম। সম্ভবত আমার চমকে ওঠা ও লক্ষ করল না। গভীর আগ্রহে আমার ঘর দেখতে লাগল। বললাম, 'তুই একটু বস। তোর ভাবিকে

ডেকে নিয়ে আসি।'

রান্নাঘরে ঢুকে দেখি এলাহি কাণ্ড। রুবা প্রবলবেগে হাঁড়িতে কী যেন নাড়ছে, গিল্টু মিয়া হাত-পা ছড়িয়ে বিপুল উৎসাহে একগাদা পেঁয়াজ কাটছে। এই ছেলের পেঁয়াজ কাটার দক্ষতা অসাধারণ। চোখের নিমেষে কেজিখানেক পেঁয়াজ কেটে দিয়ে বলে, পেঁয়াজ কাটন যে কী ঝামেলা, খালি চউখ চুলকায়। বলেই হেসে দেয়। তাকে দেখে মনে হয় না যে পেঁয়াজ কাটা ঝামেলার কাজ। রুবা সম্ভবত নতুন কিছু রান্না করছে। তার মাঝে মাঝেই রেসিপি বুক দেখে নতুন কিছু রান্না করার শখ মাথাচাড়া দেয়। বেশিরভাগই তৈরি হয় অখাদ্য, মুখে দেওয়া যায় না। ওর নতুন রান্না দেখলেই আমার বুক ধড়ফড় করে। শুধু গিল্টু মিয়ার চোখ চকচক করতে থাকে। খেয়ে বলে, 'কী জিনিস খাইলাম গো! বড়ই সোয়াদ। এমুন জিনিস আর খাই নাই।'

রুবাকে বললাম, 'আমার অনেক দিনের পুরনো এক বন্ধু এসেছে। তোমার উদ্ভট রান্না থামাও, এসো পরিচয় করিয়ে দেই।' আর গিল্টু মিয়াকে পাঠালাম বাড়ির পাশের এক ভাল রেস্টুরেন্ট থেকে বিরিয়ানি আনতে। ওরা এই জিনিসটা খুব ভাল বানায়। রুবার রান্নার উপর ভরসা করাটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

হাসান অনেক বদলে গেছে। আগের সেই উচ্ছলতা আর ওর মধ্যে নেই। কেমন একটা বিষণ্ন ভাব চলে এসেছে। রুবার সাথে অবশ্য ও হাসিমুখেই কথা বলল।

'আচ্ছা ভাই, ও কি আগে থেকেই এরকম কাঠখোট্টা স্বভাবের?' রুবা আমার প্রতি ইঙ্গিত করল।

'খুব একটা গম্ভীর স্বভাবের তো ও কখনোই ছিল না,' হাসিমুখে জবাব দিল হাসান। 'তবে এখন কেমন হয়েছে, জানি না।'

আমি বললাম, 'গম্ভীর স্বভাবের হয়েছি ওর রান্নার গুণে। খাবারের চেহারা দেখলেই গম্ভীর হয়ে যাই। তুই-ও হবি, দু'এক বেলা খা।'

হাসান হেসে উঠল হো হো করে।

রুবা চেঁচিয়ে উঠল, 'প্রথম দিনেই হাসান ভাইয়ের কাছে আমার বদনাম করছ? ভাই, আপনি ওর কথায় কান দেবেন না। জগতের সবকিছুতেই জনাবের বিরক্তি। আপনি হাতমুখ ধুয়ে আসেন, আমি টেবিলে খাবার দিচ্ছি...'

হাসান হাসিমুখে বলল, 'বেশ সুখেই আছিস তোরা। পুরোপুরি সংসারী।'

হাসলাম, 'আছি মোটামুটি। তা-তুই বিয়ে করিসনি? আছিস কোথায় এখন?'

'আপাতত হোটেলে। আর স্থায়ী নিবাস সিলেট সেন্ট্রাল জেল।'

আমাকে হঠাৎ চমকে দিতে পেরে হাসান শব্দ করে হেসে উঠল। 'তুই যা ভাবছিস, তা নয়। আমি আসামী নই। জেলের ডাক্তার। ডাক্তারি পাশ করে ওখানে ঢুকেছি। প্রত্যেক জেলেই দু'একজন ডাক্তারের প্রয়োজন হয়। চাকরি বিশেষ সুবিধার না। তবে আমার অসুবিধা হয় না, মানিয়ে নিয়েছি।'

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর বললাম, 'এত রাতে হোটেলে ফিরে কী করবি। থেকে যা এখানে। ঘর একটা ফাঁকাই আছে। সারারাত গল্প করা যাবে।'

ও শুধু হাসল। কিছু বলল না। অনেকক্ষণ ধরে আমি একাই বকবক করে গেলাম। রুবা কিছুক্ষণ আমাদের সাথে গল্প-গুজব করল। তারপর হাসানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুতে চলে গেল।

হঠাৎ হাসান বলল, 'আমার জীবনের একটি ভয়ংকর অভিজ্ঞতার গল্প শুনবি? অবশ্য তোর বিশ্বাস হবে কিনা জানি না।'

ভাবলাম, সেই চিরাচরিত লাশ কাটা ঘরের গল্প হবে হয়তো। সব মেডিকেল স্টুডেন্টের কাছেই এরকম অভিজ্ঞতার গল্প শোনা যায়। হেসে বললাম, 'কী, মেডিকেল কলেজের গল্প?'

জবাবে ও বলল, 'না, জেলখানার গল্প।'

এবার কৌতূহল বোধ করলাম। বললাম, 'কী ধরনের গল্প?'

বলল, 'চুপ করে শোন...নিজেই বুঝবি।'

'ঠিক আছে, বল।'

হাসান গল্প শুরু করল:

'আমি নতুন কাজে জয়েন করেছি। তখনকার কথা। জেলখানার পরিবেশের সঙ্গে তখনও পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারিনি। সবসময় মনে হত, একদঙ্গল দাগী আসামীর মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অবশ্য অল্প দিনেই ব্যাপারটা সয়ে গেল। জেলখানার অনেক কয়েদীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। অনেক নির্দোষ লোককেও দেখলাম, যারা মিথ্যা মামলায় হেরে গিয়ে শাস্তি ভোগ করছে। খুব খারাপ লাগত এসব দেখে। অবশ্য মন ভাল হওয়ার মত ব্যাপারও ছিল। যেমন একজন কয়েদী ছিল খুবই রসিক। অনেক সময়ই তার রসিকতায় বা কৌতুক শুনে হেসেছি প্রাণ খুলে।

মূলত আমার কাজ ছিল কোন কয়েদী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদেরকে প্রাথমিক পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা। বিশেষত কনডেম সেলে (Condemn cell) যাদেরকে রাখা হয়, নিয়মিতভাবে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা। এটা একটা রুটিন কাজ। এই কাজে সাহায্য করার জন্য সার্বক্ষণিক একজন লোকও দেওয়া হয়েছিল। তার নাম মনসুর আলী।'

এই পর্যায়ে আমি হাসানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই সব কথা পাস্ট টেন্সে বলছিস কেন? চাকরিটা কি ছেড়ে দিয়েছিস?'

উত্তরে হাসান অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল। বলল, সবটা শোন আগে:

'...ঠিক এরকম একটা সময়ে আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা ঘটল। কনডেম সেলে একজন ফাঁসির আসামী নিয়ে আসা হলো। অল্প বয়েসী ছেলে। মজার ব্যাপার হলো, সেই ছেলের নামও হাসান। একটি মেয়েকে খুন করার দায়ে আদালত তাকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছে। তার উকিল উচ্চ আদালতে আপিল করেছিল, লাভ হয়নি। আসামী আত্মপক্ষ সমর্থন করেনি। ফলে আগের রায়ই

বলবৎ ছিল। ফাঁসির আসামীকে এত কাছ থেকে এর আগে আর কখনও দেখিনি। ওর কাছে গেলেই অদ্ভুত এক অনুভূতি হত। মনে হত, আর মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই জলজ্যান্ত এই মানুষটিকে খুন করা হবে। যদিও সে নিজেও খুনি। তার শাস্তি হওয়াই উচিত। কিন্তু তারপরেও ছেলেটির জন্য অদ্ভুত এক মায়া অনুভব করতাম। আসলে ছেলেটির নিষ্পাপ চেহারা দেখে কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইত না যে এই ছেলে মানুষ খুন করতে পারে।

ফাঁসির তারিখ নির্ধারণ হয়েছিল প্রায় মাসখানেক পর। আসামীকে সেটা জানানোর নিয়ম নেই বলে সে জানত না। কিন্তু আমরা সবাই জানতাম। এই সময়ের মধ্যে তার অনেক কিছুই আমি জেনে ফেললাম। এমনিতে সে সবসময় গম্ভীর থাকলেও, প্রশ্ন করলে উত্তর দিত। কখনও মন ভাল থাকলে নিজে থেকেও অনেক কিছু বলত। বয়সে ও ছিল প্রায় আমার মতই, তাই আমাকে সম্ভবত কথা বলার উপযুক্ত সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিল।

একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, কেন খুনটা করল সে। মেয়েটি কে? প্রশ্ন শুনে সে খানিকটা বিষণ্ন হয়ে পড়ল। মনে হলো, তার জীবনের এই দুঃখময় স্মৃতি সে মনে করতে চায় না। বললাম, বলতে অসুবিধা থাকলে থাক।

'না-না, অসুবিধা নেই।' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ও। 'আসলে আমিও চাচ্ছি, আমার ঘটনাগুলো কাউকে বলে নিজের মন হালকা করি। কেউ অন্তত জানুক, খুনটা আমি কী পরিস্থিতিতে করেছিলাম, কেন করেছিলাম। ওকে এখনও ভীষণভাবে ভালবাসি। তাই যখন দেখলাম, ও এতবড় একটা অন্যায়…একটা পাপ করতে যাচ্ছে, তখন খুন করাটাই আমার কাছে সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়েছিল। বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া আমার হাতে আর কোন পথ খোলা ছিল না।' এই পর্যন্ত বলে সে একটু থামল। আমি কিছু বললাম না। ভাবলাম, নিজের ইচ্ছেতেই বলুক। একটু চুপ করে থেকে আবার শুরু করল, 'আমিও মেডিকেলের একজন ছাত্র। শেষ বর্ষে ওঠার পর খুনটা করি।'

যারপরনাই বিস্মিত হলাম। কিন্তু কথার মাঝে বাধা দিলাম না।

সে বলে চলল, 'আমি যখন দ্বিতীয় বর্ষে পড়ি, তখন আমাদেরই ক্লাসের এক মেয়ের প্রেমে পড়ে যাই। ব্যাপারটা আচমকা হয়নি। প্রথম থেকেই মেয়েটিকে আমার ভাল লাগত। কিন্তু আগে কখনও সাহস করে মনের কথাটা বলতে পারিনি। দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পর মেয়েটির সাথে আমার আন্তরিকতা বাড়ল। মনে হলো, ও-ও সম্ভবত আমাকে পছন্দ করে। আমি পড়াশোনায় ভাল ছিলাম। ও কখনও নোট নিতে অথবা পড়া বুঝে নিতে আসত। তখন গল্প-গুজবও হত। সেরকমই একদিন, গল্প করার এক ফাঁকে সাহস করে বলে ফেললাম, আমার মনের কথাটা। খুব অবাক হলো। তারপর লাজুকমুখে জানাল, ও-ও আমাকে পছন্দ করে। কিন্তু সাহস করে কখনও বলতে পারেনি। যদি আমি না করি, এই ভয়ে।

'আনন্দে আমার চিৎকার দিতে ইচ্ছা করল। মনে হলো, একটা মাইক ভাড়া

করে বের হয়ে পড়ি, শহরের সবাইকে জানিয়ে দিই এই আনন্দের কথা।

'এরপরের পুরো একটা বছর সুখ সাগরে ভাসলাম। আন্তরিক প্রেম যে এতটা আনন্দময় ব্যাপার, এ সম্পর্কে আগে আমার কোন ধারণাই ছিল না। প্রায় প্রতিদিনই ক্লাসের পর একসাথে বের হয়ে পড়তাম, সন্ধ্যা পর্যন্ত দুজন কোথাও বসে থাকতাম। হয়তো কোন পার্কে বা ফাঁকা কোন নিরিবিলি জায়গায়। মোটকথা, আমি আমার সারা জীবনে এত আনন্দময় সময় আর কখনও কাটাইনি।

'কিন্তু সমস্যা শুরু হলো তৃতীয় বর্ষে পড়ার শেষ দিকে। হঠাৎ করেই মনে হলো, ওর মধ্যে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন এসেছে। আগের সেই উচ্ছলতা আর নেই। আমার সাথে কথাও বলে দায়সারা ভঙ্গিতে। হয়তো ক্লাসের পর বললাম, চল কোথাও থেকে ঘুরে আসি। ও বলত, আজ না, আরেকদিন। আজ ভাল লাগছে না। পরিষ্কার বুঝতাম যে, আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে। শেষে একদিন উপায় না দেখে ওকে ডেকে পাঠালাম। জানতে চাইলাম কী হয়েছে? বলল, কই কিছু না তো! অনেকভাবে জিজ্ঞেস করলাম, সমস্যাটা কোথায়? আমাদের জীবনে হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল কেন? কিন্তু ওর কাছ থেকে কোন জবাব পেলাম না।

'এভাবে দিন কাটতে লাগল। হঠাৎ আমার এক বান্ধবীর মুখে এমন এক কথা শুনলাম, যা শুনে মনে হলো, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল। জানলাম, আমার ভালবাসার মানুষ, যাকে আমি নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসি, সে নাকি এখন আমাদের এক সিনিয়র ভাইয়ের প্রতি দুর্বল। তার সঙ্গে নাকি মাঝে মাঝে ঘুরতেও বের হয়। আমি কোন কিছুই বিশ্বাস করতে পারলাম না। ছুটে গেলাম ওর কাছে। সবকথা খুলে বলে জানতে চাইলাম এসব সত্যি কিনা। ও সরাসরি সব কিছু অস্বীকার করল। বলল, সে শুধু একজনকেই ভালবাসে…আমাকে। আর ওই সিনিয়র ভাইকে শুধু বড়ভাই বলেই জানে, এর বেশি কিছু না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। মনে হলো, বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেল। তবু মনের এক কোনায় একটা অস্বস্তি রয়েই গেল।

'এর কয়েকদিন পরের কথা। বন্ধুর সঙ্গে নিউমার্কেটে গেছি। টুপটাপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। চিন্তা করছি কোথায় দাঁড়ানো যায়। হঠাৎ বন্ধুটি আমার হাত চেপে ধরল। চোখ বড়বড় করে বলল, দেখ! দেখ! আমি যা দেখলাম, তাতে আমার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেল। দেখি ও একটা ছেলের হাত ধরে হাসতে হাসতে নিউমার্কেটের গেট দিয়ে বের হচ্ছে। ছেলেটি আর কেউ নয়, আমাদের সেই সিনিয়র ভাই! আমার বুকটা ভেঙে গেল। কী যে অবর্ণনীয় কষ্ট পেলাম, তা আপনাকে বোঝাতে পারব না। মনে হচ্ছিল, হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যাচ্ছে। কীভাবে বাসায় ফিরে এসেছি নিজেও জানি না।

'হঠাৎ করেই সিদ্ধান্তটা নিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম…ওকে মেরে ফেলব। ও একই সাথে আমাদের দুজনের সাথে প্রতারণা করছে, দুটি জীবন নিয়ে খেলছে। এতবড় অন্যায় ওকে করতে দিতে পারি না। ঠিক করলাম, ওকে মেরে ফেলে, আমিও আত্মহত্যা করব। কেবলমাত্র এভাবেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব ওই সিনিয়র

ভাইটির হাত থেকে। সিদ্ধান্তটা নেয়ার পর নিজেকে অনেক হালকা মনে হলো।

'ধীরে ধীরে মনকে প্রস্তুত করতে শুরু করলাম। এরমধ্যে ওকে বেশ কয়েকবার ফলো করে নিশ্চিত হয়েছি, একসময় যে অভিনয় ও আমার সাথে শুরু করেছিল, সেই একই খেলা এখন চালাচ্ছে সিনিয়র ভাইটির সঙ্গে। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় ওকে ল্যাবে দেখা করতে বললাম। ওই সময়টায় ল্যাব নির্জন এবং ফাঁকা থাকে। আমার পকেটে পটাশিয়াম সায়ানাইডের শিশি, হাতে নাইলন কর্ড। কোন কিছু সন্দেহ না করেই ও ল্যাবে ঢুকল। আমিও প্রস্তুত ছিলাম, হঠাৎ পেছন থেকে গলায় নাইলন কর্ডের ফাঁস আটকে নিলাম। অন্য হাতে চেপে ধরলাম ওর মুখ। কিছুক্ষণ হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করল, তারপর সব শেষ। মারা যেতে সব মিলিয়ে মিনিট পাঁচেক সময় নিল। এত সহজে একজন মানুষকে মেরে ফেলা যায়, আমার বিশ্বাস হতে চাইছিল না। নিথর দেহটা আস্তে করে মেঝেতে শুইয়ে দিলাম। আমি বরাবরই ভীতু স্বভাবের। তাই বিষের শিশি পকেটে থাকা সত্ত্বেও খেতে পারলাম না। বরং সত্যিই সত্যিই মারা গেছে এটা বুঝতে পেরে ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলাম। তারপর ওর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম। আমার চিৎকারে কৌতূহলী ছেলেরা ছুটে এসে আমাকে ওই অবস্থায় আবিষ্কার করে এবং পুলিশে খবর দেয়। দ্যাটস অল...এই হলো আমার জীবনের গল্প...'

এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে গল্প শুনছিলাম, এখন হঠাৎ নিস্তব্ধতায় চমক ভাঙল। অবাক হয়ে দেখি, ওর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। বলল, 'বুঝলেন, জীবনে কখনও কোন মেয়েকে বিশ্বাস করবেন না। মেয়ে মানেই বিশ্বাসঘাতক। ভালওবাসবেন না কাউকে।

বললাম, 'একটি মেয়েকে দেখে সব মেয়ের বিচার করা কি ঠিক? সবার মধ্যেই ভালমন্দ আছে।' ও কোন কথা বলল না, জ্বলন্ত চোখে শুধু একবার তাকাল আমার দিকে। হঠাৎই পরিবেশটা অসহনীয় মনে হলো। আর কিছু না বলে চলে এলাম ওর কাছ থেকে।

এরপর থেকে ও আমার সাথে কথাবার্তা একেবারেই কমিয়ে দিল। কিছু জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ-না এর মধ্যেই সারার চেষ্টা করত। মনে হলো, ওর যা বলার ছিল, বলে ফেলেছে। আর কিছু বলার নেই।

এরমধ্যে ফাঁসির দিন চলে এল। আজ রাত ১২টা ১ মিনিটে হাসান নামের ছেলেটির ফাঁসি কার্যকর করা হবে। সারাদিন ধরে চলেছে ব্যাপক প্রস্তুতি। আমার খুবই খারাপ লাগছে। সময় যত এগিয়ে আসছে খারাপ লাগার ভাবটা ততই বাড়ছে। চোখের সামনে জলজ্যান্ত একজন মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় মেরে ফেলতে দেখা খুবই শক্ত। মন থেকে ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। দুপুরে দেখা করতে গেলাম। ও সম্ভবত আমার চেহারা দেখেই কিছু একটা অনুমান করে নিল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

নিয়ম মাফিক ফাঁসি কার্যকর করার ৩ ঘণ্টা আগে, অর্থাৎ রাত ১০ টায়

জেলার সাহেব নিজে এসে ওর সাথে দেখা করলেন এবং আজ রাতে তার ফাঁসি কার্যকর করার হুকুমনামা পড়ে শোনালেন। হাসান নির্বিকার মুখে শুধু শুনে গেল। একজন মাওলানা আনা হয়েছিল। তিনি ওকে ওযু করিয়ে তওবা করালেন এবং এশার নামায পড়ার পর চার রাকাত নফল নামায পড়ার পরামর্শ দিলেন। ও সব নির্দেশ নিঃশব্দে পালন করল। তারপর আমার সাথে দেখা করতে চাইল।

যেয়ে দেখলাম, ও চুপচাপ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। পাশে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বলবে? হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে, ও আমার ডান হাতটা দু'হাতে চেপে ধরে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠল। বলল, মৃত্যুর পর কোথায় যাব আমি জানি না, খোদা আমাকে কী শাস্তি দেবেন তাও জানি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, পিয়ালকে খুন করে আমি কোন অন্যায় করিনি। বরং ওকে একটা অন্যায় করা থেকে বাঁচিয়েছি। কথাটা আপনার কাছে হয়তো হাস্যকর শোনাচ্ছে, কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি। একটু থামল ও, তারপর চোখ বড়বড় করে বলল, ডাক্তার, আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, কিন্তু···কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, পিয়াল আমাকে নিতে এসেছে। ওর সেই পরিচিত হাসি আমি শুনেছি। জানেন ডাক্তার, ওর মত সুন্দর হাসি আর কোন মেয়ের মুখে আমি দেখিনি।

সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেলাম না। কারণ আমার নিজের চোখও তখন ভিজে উঠেছে। শুধু বললাম, ও নিশ্চয় এখন জানে, তুমি তাকে পাগলের মত ভালবাসতে বলেই এ কাজ করেছ। আমার বিশ্বাস সে তোমাকে মাফ করে দিয়েছে এবং অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তোমার আসার।

হাসান উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকাল। বিড়বিড় করে বলল, থ্যাংকস ডক্টর। তাই যেন হয়।

ওকে ফাঁসির মঞ্চে ওঠানো হলো ১২ টা বাজার ২ মিনিট আগে। মাথা কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়ার আগে একবার আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসার চেষ্টা করল। চোখ তখনও ভেজা। হঠাৎ করে বুকের মধ্যে ভয়ংকর কষ্ট অনুভব করলাম। মনে হলো, দৌড়ে যেয়ে ওকে ছাড়িয়ে আনি ওখান থেকে। কিন্তু কতটুকুই বা আমার ক্ষমতা?

ঠিক ১২টা ১ মিনিটে জেলারের নির্দেশে সবকিছু শেষ হয়ে গেল। পোস্টমর্টেমেরও দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। পোস্টমর্টেম করে, মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার সার্টিফিকেট দিতে হবে। এর কোন দরকার ছিল না। ছেলেটির ঘাড়ের কশেরুকা বিচ্ছিন্ন হয়ে তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটেছে। সম্ভবত মৃত্যু যন্ত্রণা টের পাওয়ারও সময় পায়নি। যাই হোক, সব কিছু শেষ করে, ডেথ সার্টিফিকেট রেডি করে, বাড়ি ফেরার উদ্দেশে জেল কম্পাউন্ডের ভিতরে পা রাখলাম। মেইন গেটের দিকে এগোতে যাব, এই সময় একটা ব্যাপার হলো। প্রচণ্ড ভয়ে আমার শরীর কেঁপে উঠল। পা দুটো অসাড় হয়ে গেল। মনে হলো, আমার চারপাশে কিছু একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন কিছু, যার সাথে এই চেনা জানা জগতের কোন যোগাযোগ নেই। হঠাৎ করেই প্রবল ইচ্ছে হলো, কিছু দূরের ফাঁসি মঞ্চের দিকে

তাকানোর। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল, ওদিকে তাকালেই ভয়ংকর কিছু একটা দেখব আমি, যা হয়তো সহ্য করতে পারব না। মনের প্রচণ্ড অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফাঁসি মঞ্চটার দিকে ঘুরে তাকালাম। দেখলাম···

এই পর্যন্ত বলে থামল হাসান। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করলাম। গল্পের উত্তেজনায় কখন যে সোফায় পা তুলে বসেছি, খেয়াল করিনি।

হাসান বলল, 'বলছি। তার আগে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি আন। গলাটা ভিজিয়ে নেই।'

ফ্রিজ থেকে পানির বোতল বের করলাম। সাথে হালকা কিছু খাবার নিয়ে বসার ঘরে ঢুকলাম। বসার ঘরে ঢুকতেই হঠাৎ মনে হলো, কোথাও কেউ নেই। হতভম্ব হয়ে দেখলাম, সোফার মধ্যে খুব ধীরে ধীরে একটা ছায়া হাসানের আকৃতি নিচ্ছে। হাত-পা, মুখ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ কারণটা বুঝতে পেরে মনে মনে হেসে ফেললাম। আসলে হাসান ওর জায়গায় ঠিকই আছে, আমার চোখ ঘুমে জড়িয়ে গেছে। এজন্য এরকম মনে হয়েছে। রাত জাগার ফল। মাথা জট পাকিয়ে গেছে।

'কী রে! বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

ওর কথায় চমক ভাঙল। সোফার সামনের টেবিলের উপর হাতের জিনিসগুলো নামিয়ে রাখলাম। হাসান বোতল খুলে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খেল। লক্ষ করলাম, চোখজোড়া লাল হয়ে গেছে। বললাম, 'তুই না হয় ঘুমিয়ে পড়। গল্পের বাকিটা কাল শুনব।'

'না,' বলে মাথা নাড়ল হাসান। 'পুরোটা একবারে না শুনলে ভাল লাগবে না।'

আমি আর কিছু বললাম না।

ও আবার শুরু করল:

'···ভয়ে আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল। জানি না কীসের আকর্ষণে ধীরে ধীরে ঘুরে তাকালাম ফাঁসির মঞ্চের দিকে এবং দেখলাম···হ্যাঁ পরিষ্কার দেখলাম, একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চের উপর। ছায়ামূর্তিটির মাথা কালো কাপড়ে ঢাকা, হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। মূর্তিটি সম্ভবত এক হাত উঁচু করার চেষ্টা করল, কিন্তু হাত বাঁধা থাকায় পারল না। কতক্ষণ সেখানে নিজেই মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। হুঁশ ফিরল মনসুরের ডাকে।

'কী ব্যাপার, সার! এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছেন?'

হাত ইশারায় মনসুরকে কাছে ডাকলাম। সে এগিয়ে এল। আমার চোখমুখ দেখে সম্ভবত কিছু একটা আঁচ করল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, সার?'

কাঁপা গলায় বললাম, 'মনসুর, ফাঁসির মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখো তো। কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'কই! না তো স্যার, কিছু দেখলাম না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি তো রাতে থাকছ, তাই না?'

'জ্বি, সার।'

'কোন সমস্যা হলে ফোন কোরো।'

'আচ্ছা, সার।'

আমি দ্রুত গেটের দিকে পা চালালাম। ঘাড় না ফিরিয়েও বুঝতে পারলাম মনসুর অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বোধহয় কিছুটা ভয়ও পেয়েছে।

বাসার গেটে আসার পর বুঝলাম কী পরিমাণ ক্লান্ত আমি। পা দুটো যেন আর চলতে চাইছে না। মনকে বোঝালাম, যা দেখেছি শরীর ও মনের উপর ভয়ংকর চাপের কারণেই দেখেছি। হ্যালুসিনেশন, আর কিছু না। মন অসম্ভব উত্তেজিত বা ক্লান্ত থাকলে মানুষ অনেক সময় উল্টোপাল্টা জিনিস দেখে বা শোনে। এরপর হয়তো কিছু শুনতেও পাব।

কলিংবেল বাজানোর অনেকক্ষণ পর কাজের ছেলেটা দরজা খুলে দিল। আমি বিয়ে করিনি। ফাই-ফরমাশ খাটার জন্য একটা কাজের ছেলে আছে। আর একটা ঠিকা ঝি এসে তিনবেলা রান্না করে দিয়ে যায়। অসুবিধা তেমন একটা কখনও হয় না। কিন্তু এই প্রথম মনে হলো, ঘরে একজন সঙ্গী থাকা দরকার। যার সাথে মন খুলে সব কথা বলা যায়। ফিরতে রাত হলে যে কৈফিয়ত তলব করবে, 'কী ব্যাপার, এত রাত করলে? তোমার জন্য না খেয়ে বসে আছি। শরীর খারাপ করেনি তো?'

টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। কিন্তু তুলে খাওয়ার শক্তিটুকুও নেই। কোনমতে জুতো জোড়া ছেড়ে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছি। এই সময় বেয়াড়া শব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠল। ভয়ানক চমকে উঠলাম। মনের দিক দিয়ে কতখানি দুর্বল হয়ে পড়েছি চিন্তা করে অবাক লাগল।

টেলিফোনটা ধরার আগে মনে হলো, ওটা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক আস্তে বাজছে। সেটের কোন গণ্ডগোল কিনা বুঝতে পারলাম না। রিসিভারটা তুলে কানে ঠেকালাম, 'হ্যালো, কে বলছেন?'

ও প্রান্তে শুধু দুর্বোধ্য ফিসফিসানি শোনা গেল। মনে হলো, কোন ছোট বাচ্চা জীবনে প্রথম শিস দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু শব্দ হচ্ছে না।

'হ্যালো, কে আপনি? আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না।' আবার সেই ফিসফিস শব্দ। তারপর লাইন কেটে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে এক্সচেঞ্জে ফোন করলাম। অপারেটরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, কোন নাম্বার থেকে আমাকে এই মাত্র ফোন করা হয়েছিল?'

কিছুক্ষণ পর অপারেটর আমাকে একটা নাম্বার দিল। অবাক হয়ে দেখলাম, এটা জেলখানায় আমার চেম্বারের নাম্বার। ওখানে এখন মনসুরের থাকার কথা।

অপারেটরকে বললাম, 'আমার লাইনটা ওখানে দিন, প্লিজ।'

সংযোগ পেলাম। মনসুর ফোন ধরল।

'হ্যালো?'

'হ্যালো, কে মনসুর? আমি হাসান।'

'জ্বি, সার, বলেন।'

'তুমি কি এইমাত্র আমাকে ফোন করেছিলে?'

'জ্বি-না সার। আমি তো আপনাকে ফোন করিনি।'

'তুমি কি নিশ্চিত? অপারেটর জানাল এই নাম্বার থেকে এসেছে।'

'আমি নিশ্চিত, সার। অপারেটর নিশ্চয় ভুল করেছে।'

'ঠিক আছে, ফোন রাখছি।'

'ঠিক আছে, সার, স্লামালিকুম।'

ফোন রেখে চেয়ারে এসে বসলাম। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন খাপছাড়া। কাজের ছেলেটিকে ডাকতে যেয়ে দেখি বেচারা অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে এসে না খেয়েই শুয়ে পড়লাম।

পরদিন যথারীতি কাজে গেলাম। জেল কম্পাউন্ডের মধ্যে পা দিয়েই আবার কাল রাতের মত অনুভূতি হলো। কোন কারণ ছাড়াই ভয়ের একটা শীতল স্রোত নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। অনুভূতিটা রাতের মত অত তীব্র না হলেও খুব কমও না। পরিষ্কার অনুভব করলাম আমার চারপাশে অশরীরী কোন কিছুর অস্তিত্ব।

চেম্বারে যাওয়ার আগেই মনসুরকে পেলাম। ওকে কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হলো। অথচ ওর মত সাহসী লোক আমি খুব কম দেখেছি।

'কী ব্যাপার, মনসুর?'

'সার...। গলা কেঁপে গেল মনসুরের। 'আমি ঠিক জানি না এখানে কী হচ্ছে। কিন্তু আমি আর রাতে এখানে থাকব না।'

'কেন, কী হয়েছে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'কিছু একটা আছে এখানে, সার...অন্য কিছু।' ও ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলল।

'অন্য কিছু মানে?'

'আমি ঠিক জানি না, সার। কাল রাতে আপনি ফোন করার আগে পর্যন্ত মনে হয়েছে, আমি ভুল দেখেছি। মাথায় কিছু হয়েছে। কিন্তু...'

মনসুরকে টেনে নিয়ে আমার চেম্বারে ঢুকলাম। ওকে চেয়ারে বসিয়ে বললাম, 'মনসুর, আমাকে সব কিছু খুলে বল। হয়তো আমি কিছু বুঝতে পারব। কালরাত থেকে আমারও একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে।' আমার কথা শুনে ওর মুখ আরও শুকিয়ে গেল।

বলল, 'সার...সার বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না। কালরাতে আমি সত্যিই কিছু একটা দেখেছি...ফোনের কাছে।'

'কিছু খাওনি তো? তোমার তো আবার মাঝে মধ্যে মদ্যপানের অভ্যেস আছে।'

'খোদার কসম, সার!' মনসুর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। 'কালরাতে এক

ফোঁটাও ছুঁয়েও দেখিনি।'

'কখন দেখেছ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'রাতে। আপনি যখন ফোন করলেন, তার সামান্য আগে।'

'তখন বললে না কেন?'

'তখনও, সার, বুঝতে পারিনি। ভেবেছি মনের ভুল। পরে বুঝেছি যা দেখেছি সব সত্যি। তখন, সার, ভয় পেয়েছি, ভীষণ ভয়। সার, বলতে লজ্জা লাগছে, ভয়ে আমি ঘর থেকে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। বারান্দায় বসে রাত পার করেছি।'

'বুঝতে পারছি। তোমারই যদি এই অবস্থা হয়...,' আর কী বলব ভেবে পেলাম না। আসলে মাথায় সবকিছু জট পাকিয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে।

'সার...একটা হালকা ধোঁয়ার মত জিনিস ঘরে ঢুকেছিল। আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়, মাছের আঁশটে গন্ধ পেয়েছি। ওটা ফোনের চারপাশে ঘুরছিল। আর, সার, কী ভয়ংকর ঠাণ্ডা!'

'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না, সার। ও...ওহ্ সার, আরেকটা ব্যাপার। আপনার টেলিফোন আসার কিছুক্ষণ আগে, কনডেম সেলের পাশের সেলের কিছু কয়েদী হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। একজন কয়েদি পাগলের মত গরাদে মাথা ঠুকতে থাকে। পরে প্রহরীরা এসে ওদের শান্ত করে।'

'ঠিক আছে, মনসুর। তোমার আজ আর রাতে এখানে থাকার দরকার নেই। দু'একদিন বাসায় বিশ্রাম নাও। টেনশানের কারণেও এরকম হতে পারে। এখানকার কাজ আমিই সামলাতে পারব।'

'ঠিক আছে, সার। ধন্যবাদ।'

মনসুরকে এখান থেকে সরিয়ে দিলাম বিশেষ একটি কারণে। দেখা যাক পরিকল্পনাটা কাজে লাগে কিনা। আরও কিছু ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু আমার একার পক্ষে এতসব করা সম্ভব না। কাজেই সে চিন্তা বাদ দিলাম।

পুরোপুরি বিধ্বস্ত অবস্থায় বাসায় ফিরলাম। সারাদিনে কাজ কিছুই করতে পারিনি। প্রত্যেকটা মুহূর্তেই অনুভব করেছি অপার্থিব কোন কিছুর অস্তিত্ব। কেন জানি মনে হচ্ছে ওটা হাসান। সে সম্ভবত আমাকে কিছু বলতে চায়। যদিও এরকম মনে হওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু ও মারা যাওয়ার পর থেকেই এসব ঘটতে শুরু করেছে। আমি ভীতু প্রকৃতির নই। ভূত-প্রেত বিশ্বাসও করি না। তারপরও এরকম মনে হওয়ায় নিজের উপরই বিরক্ত লাগল। ঠিক করলাম আজও রাত ২টা পর্যন্ত জেগে বসে থাকব, দেখি কিছু হয় কিনা। বারে বারেই কেন যেন মনে হচ্ছে আজও ফোন আসবে। ফোনের মাধ্যমে আমাকে কিছু বলতে চেষ্টা করবে। কাল হয়তো মনসুর থাকায় পারেনি। কিন্তু আজ মনসুর নেই।

রাত ২টা পর্যন্ত হাতে একটা বই নিয়ে ফোনের সামনে বসে থাকলাম। বইয়ে মন বসছে না, বার বার টেলিফোনটার দিকে চোখ যাচ্ছে। কাল সম্ভবত

হ্যালুসিনেশনই হয়েছিল। প্রথমে ভিজ্যুয়াল তারপর অডিটরি হ্যালুসিনেশন। কিন্তু মনসুরের ব্যাপারটা? আবার মাথায় সব জট পাকিয়ে গেল। বইয়ে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। ফরেনসিক মেডিসিন অ্যান্ড টক্সিকোলজির উপরে লেখা। লেখক লিখেছেন ভালই, প্রতিটি চ্যাপ্টারই খুব গুছিয়ে লেখা আর উদাহরণ টেনেছেন প্রচুর। কিন্তু পড়া এগোচ্ছে না, কী পড়ছি কিছুই মাথায় ঢুকছে না...

হঠাৎ করেই ফোনটা বেজে উঠল। আবারও চমকে উঠলাম, তবে কালকের মত না। কেউ বলে না দিলেও বুঝতে পারছি, কালকের ফোনই এসেছে। ফোনটা বাজছে মৃদুভাবে। মনে হচ্ছে, পাশের বাড়ির টেলিফোনের আওয়াজ। কাঁপা হাতে রিসিভার তুললাম। 'হ্যালো?'

টেলিফোনের অপর প্রান্তে আজ আর ফিসফিসানি নেই। তার বদলে চাপা কান্না আর ফোঁপানির মত শব্দ। আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম। এরকম বীভৎস গোঙানি কোন মানুষের কণ্ঠ দিয়ে বের হতে পারে না। আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। হাত-পা অসাড় মনে হলো। কাঁপা গলায় আবার বললাম, 'হ্যালো? কাকে চাচ্ছেন?'

জবাবে আবার শুনতে পেলাম সেই ভয়ংকর ফোঁপানি। মনে হলো, অনেক দূর থেকে কিছু কথা ভেসে আসছে। অনেকক্ষণ পর শুনলাম, 'ডা...ডাক্তার?'

'জ্বী, হ্যাঁ, বলছি। বলুন...'

'আ-আ-আমি ব...বলতে চাই। অবশ্যই চাই। পাপ...পাপ খণ্ডাতে চাই।'

'আপনি কে বলছেন?' যদিও আমি জানতাম উত্তরটা কী হবে।

'আ...আমি? আ...আমি কে? ...কে? আমি...আমি হাসান।'

আবারও শিউরে উঠলাম। এটা অসম্ভব। হতেই পারে না। একজন মৃত মানুষের আমার সাথে কথা বলার কোন কারণ নেই। তাও আবার ফোনের মত একটা আধুনিক যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে। আসলে সম্ভবত কিছুই ঘটছে না। সব আমার কল্পনা। তবুও বললাম, 'বলো, কী করতে পারি তোমার জন্যে।'

'আ...আপনি তাকে বলেন। তাকে...আসতে বলেন।'

'কাকে আসতে বলব? কোথায়?'

'সেই...সেই টুপিওয়ালা। দাড়িওয়ালা...লোক। যিনি আমার মৃত্যুর আগে এসেছিলেন।'

'আচ্ছা আচ্ছা! সেই মাওলানা সাহেব?'

'হ্যাঁ...হ্যাঁ। তাকে...তাকে এখানে...আসতে বলেন। কাল রাতে। আ...আমি আর পা...পারছি না। খুব...খুব ঠা...ঠাণ্ডা এখানে। কাল আসতে...বলেন। রাতে...। খু-উ-উ-ব ঠাণ্ডা-আ-আ-আ...'

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল কণ্ঠটা। সেই সঙ্গে ফোঁপানিও ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল।

হতভম্ব হয়ে চেয়ারে বসে পড়লাম। লক্ষ করলাম, গায়ের কাপড় ঘামে ভিজে গেছে। কপাল এবং জুলফি বেয়ে পানি নামছে। বুক ধড়ফড় করছে। এই আষাঢ়ে

গল্প মাওলানা সাহেবকে বলার কোন মানেই হয় না। ওঁনাকে যদি বলি, গতকাল যাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, সেই হাসানের আত্মা ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেছে, তবে তিনি নির্ঘাত আমাকে পাগল ঠাওরাবেন। সামনে হয়তো ঠিকই হ্যাঁ-হুঁ বলবেন। আড়ালে গেলেই বলবেন, ব্যাটা বদ্ধ পাগল। এই অবস্থায় চাকরি করছে কীভাবে?

পুরো রাতটাই জেগে কাটালাম। মনের মধ্যে হাসান নামের ছেলেটির জন্য অদ্ভুত এক মায়া অনুভব করছি। চোখে ভাসছে ওর নিষ্পাপ চেহারা, ভেজা চোখ। দুঃসহ স্মৃতি। কী করব কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলাম না। শেষে ভাবলাম, আগে মাওলানা সাহেবের সাথে দেখা করি। তারপর যা হয়, দেখা যাবে। ঠিক করলাম আগামীকাল রাতে ওঁনাকে আমার সাথে খেতে বলব।

মাওলানা সাহেবের নাম ইরতাজ উদ্দিন আহমেদ। ছোটখাট গড়নের মানুষ। আলগা একটা গাম্ভীর্য সবসময় মুখে লেগে থাকে। দেখে মনে হয় রেগে আছেন। সেদিন দেখে যতটা বয়স্ক মনে হয়েছিল, আজ তার চেয়ে কম বয়স্ক মনে হচ্ছে। উনি চোখে সুরমা লাগিয়েছেন। চোখে সুরমা দেওয়ার কারণেই বয়স কম মনে হচ্ছে কিনা কে জানে। চেহারাতেও কেমন একটা শিশুসুলভ ভাব চলে এসেছে। দেখে মনে হচ্ছে, স্কুলের কোন বাচ্চার মুখে অদ্ভুত উপায়ে হঠাৎ দাড়ি গজিয়ে গেছে।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ওঁনাকে নিয়ে গল্পে বসলাম। উনি বললেন, 'আপনি বললেন আমার সাথে জরুরি কথা আছে। কিন্তু কী প্রসঙ্গে?' বললাম, 'আমার কথা আপনার কাছে পাগলের প্রলাপ মনে হতে পারে। এজন্য ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।'

উনি মৃদু হেসে বললেন, 'আমি অন্তত তা মনে করব না। আপনি নিশ্চিন্তে বলুন।'

'আপনি আত্মা বা ভূত বিশ্বাস করেন?'

'আত্মা অবশ্যই বিশ্বাস করি। তবে ভূত বিশ্বাস করি না। ভূত বলে জগতে কিছু নেই। কিন্তু জিন বলে একটি জাতি রয়েছে। যার বর্ণনা আমাদের পবিত্র কোরআন শরীফে রয়েছে।'

'মাওলানা সাহেব, হাসান নামের ছেলেটির কথা তো আপনার নিশ্চয় মনে আছে, দু-দিন আগে যার ফাঁসি হয়েছে। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, সে আমার সাথে এক অদ্ভুত উপায়ে যোগাযোগ করেছে। তার সাথে আমার কথাও হয়েছে। আসলে, তার কথাতেই আজ আপনাকে এখানে ডেকেছি। সে সম্ভবত আপনাকে কিছু বলতে চায়।'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে একটু থামলাম। তাকিয়ে দেখি, মাওলানা সাহেবের মুখে বিরক্তির রেখা সুস্পষ্ট। উনি বললেন, 'দেখুন ডাক্তার সাহেব, আমি বিজ্ঞানের লোক না। কিন্তু তারপরও মনের দিক দিয়ে আমি পুরোপুরি বিজ্ঞানমনস্ক। আমি কোন কুসংস্কার বা আধিভৌতিক ব্যাপারকে প্রশ্রয় দেই না।

কারণ আমি জানি এগুলোর বাস মনে। আত্মা অবশ্যই আছে, তবে সেগুলো যখন দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন তারা তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে চলে যায়। তাদের পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করার কোন কারণই নেই। আপনি উচ্চ শিক্ষিত এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েও এসব বিশ্বাস করেন। অবাক লাগছে।'

উনি বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকালেন। তারপর আবার বললেন, 'এটাই যদি আপনার একমাত্র জরুরি কথা হয়ে থাকে, তবে আমি রাত্রে আপনার এখানে থাকার কোন প্রয়োজন দেখছি না। বাসায় অনেক জরুরি কাজ ফেলে এসেছি। আজ রাতেই আমার মেয়ে এবং মেয়ে জামাই ময়মনসিংহ থেকে আসার কথা। তাদের আনতে স্টেশনে যেতে হত। তবু আপনার কথা ভেবে এখানেই এসেছি। কিন্তু এসব বলার জন্য ডেকেছেন ভাবিনি।'

ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। মনে হচ্ছে, যা হওয়ার হোক। আমার আর কিছুতেই কিছু যায় আসে না। যে কথাগুলো আমিই এতদিন অন্যদের বলে এসেছি, সে কথাগুলোই এখন অন্য একজনের মুখ থেকে আমাকে শুনতে হচ্ছে। এরচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার আর কী হতে পারে?

শেষ পর্যন্ত বললাম, 'আপনি অন্তত আজ রাতটা আমার জন্য হলেও এখানে থাকুন। আপনার কাছে আমার অনুরোধ।' আমার চেহারা দেখে সম্ভবত মাওলানা সাহেবের মায়া হলো। উনি মত পাল্টালেন। বললেন, 'ঠিক আছে, অনেক রাত হয়েছে। থেকেই যাই আপনার সঙ্গে। ভাগ্য ভাল হলে হয়তো আপনার প্রেতাত্মার সাথেও দেখা হয়ে যেতে পারে।'

ওঁনার কণ্ঠের পরিহাসটুকু স্পষ্টই বুঝলাম। মনে মনে ভাবলাম, এতকিছুর পর যদি আজ কিছুই না ঘটে, তবে কালকেই সারা শহর জেনে যাবে আমার পাগলামির কথা।

উনি আমার অস্থিরতা লক্ষ করে বললেন, 'এমনও তো হতে পারে, কেউ আপনার সাথে রসিকতা করার চেষ্টা করছে।'

'নাহ্।' দুর্বল ভাবে মাথা নাড়লাম। 'আমি আমার ভেতর থেকে ওটার অস্তিত্ব অনুভব করি। আর তা ছাড়া আমার সাথে এরকম রসিকতা করার মত লোকও এই শহরে নেই।'

হঠাৎ ফোনের শব্দে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। গল্পে গল্পে কখন দুটো বেজে গিয়েছে খেয়ালই করিনি। পরিষ্কার বুঝতে পারছি এটাই সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ফোন কল।

'শুনতে পাচ্ছেন? টেলিফোন...টেলিফোন বাজছে!' উত্তেজিত স্বরে বললাম।

'কই...আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। আর শুনতে পেলেই বা কী? ফোন তো যে কোন সময় বাজতেই পারে।'

আমি ওঁনার কথা শোনার অপেক্ষা না করে, দুই লাফে বেড রুমে ঢুকেই রিসিভার কানে লাগালাম। 'হ্যালো?'

সেই চাপাস্বরে ফোঁপানি শুনতে পেলাম। বললাম, 'আমি ডাক্তার বলছি।

মাওলানা সাহেবও এখানেই আছেন। আমি চেষ্টা করছি উনি যেন তোমার সাথে কথা বলেন।'

এতক্ষণ অনেক শক্ত শক্ত কথা বললেও এই মুহূর্তে ওঁনাকে বেশ নার্ভাস মনে হলো। কোন কথা না বলে ধীর পায়ে এগিয়ে যেয়ে রিসিভার তুলে নিলেন। 'হ্যালো, কে?'

ওপাশ থেকে কী জবাব এল জানি না, কিন্তু লক্ষ করলাম ওঁনার চেহারা ধীরে ধীরে ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। কাঁপা গলায় বললেন, 'আমি...আমি চেষ্টা করব। জানি না কাজ হবে কিনা। কিন্তু আমি অবশ্যই চেষ্টা করব।'

হতভম্ব হয়ে ফোন রেখে উনি চেয়ারে এসে বসলেন। বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকলেন। তারপর যখন কথা বললেন, মনে হলো, বহুদূর থেকে ওঁনার কথা ভেসে আসছে।

'ডাক্তার সাহেব, এটা রসিকতা! স্রেফ রসিকতা!' দুর্বল ভঙ্গিতে বললেন উনি। 'আপনার মানসিক দুর্বলতার কথা জেনে, কেউ এই ভয়ংকর রসিকতা করছে।'

'কিন্তু আপনি কথা বলার সময় নিশ্চয় ওটার অস্তিত্ব অনুভব করেছেন?' বললাম আমি। 'আমি জানি আপনি তা অস্বীকার করতে পারবেন না। এটা কোন মানুষের কাজ না।'

মাওলানা সাহেব আর কোন কথা বললেন না। অবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বসে রইলেন চেয়ারে। তাঁর হতভম্ব ভাবটা এখনও কাটেনি। বিড়বিড় করে বললেন, 'ওর হয়ে আল্লাহর কাছে আমাকে ক্ষমা চাইতে বলছে। ও মৃত্যুর পর বুঝতে পারছে মেয়েটার নাকি আসলে কোন দোষ ছিল না। শুধু শুধুই ওকে খুন করেছে। এখন ক্ষমা না পেলে ওর আত্মা মুক্তি পাবে না। এই জেলখানার ভিতরেই কষ্ট পাবে। কিন্তু এটা অসম্ভব...একেবারেই অসম্ভব।'

'কী অসম্ভব?' সব বুঝতে পেরেও বোকার মত প্রশ্ন করলাম।

'ওর কথা বলাটা। একজন মৃত মানুষ কখনোই কথা বলতে পারে না।'

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

'আমি ওর আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করব,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুললেন উনি। 'পুরো ব্যাপারটা সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, বা কল্পনাই হোক, কিছু যায় আসে না। কারও আত্মার জন্যে প্রার্থনা করাটা দোষের কিছু নয়।'

সেই ভয়াবহ রাতটা আমরা জেগেই কাটিয়েছিলাম। ফজরের আযান দেওয়ার সাথে সাথে মাওলানা সাহেব বিদায় নিয়েছিলেন আমার বাসা থেকে। হাসানের জন্য উনি দোয়াও নিশ্চয় করেছিলেন। কারণ জেল কম্পাউন্ডের ভিতর আমি আর কখনোই কোন রকম অস্বস্তি অনুভব করিনি। কোনও অদ্ভুত ফোনও আর আসেনি। মনসুর আবার কাজে যোগ দিয়েছে।

মাওলানা সাহেবের সাথে এরপর অনেকবার আমার দেখা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, সেই রাতের ব্যাপারটা উনি আর কখনোই স্বীকার করেননি। উনি

বিশ্বাস করতেন, সেদিন আমরা দুজনেই মানসিকভাবে উত্তেজিত ছিলাম। সেজন্যই ওরকম হয়েছে। মাঝে মাঝে হেসে বলতেন, 'ডাক্তার সাহেব, সেদিন ভয়টা যা দেখিয়েছিলেন। ওফ্!'

প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করত না। মাঝে মাঝে নিজের উপরেই সন্দেহ হয়। সেদিন আমি সত্যিই কি কিছু দেখেছিলাম বা শুনেছিলাম? নাকি আসলেই হ্যালুসিনেশন?'

হাসান হঠাৎই চুপ করে গেল। তার গল্প এখানেই শেষ হলো।

তারপর হেসে বলল, 'আমার জীবনের একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা তোকে বললাম। এখন যা শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে, আমাকেও ঘুমোতে দে।'

মনে কয়েকটা প্রশ্ন এসেছিল। কিন্তু রাত অনেক হয়েছে দেখে আর করলাম না। ভাবলাম, কাল সকালে জিজ্ঞেস করলেও চলবে।

ওকে ওর ঘর দেখিয়ে দিয়ে, সবকিছু ঠিকঠাক করে দিলাম। তারপর বিদায় নেওয়ার আগে হঠাৎ ও ডাক দিল আমাকে। করুণ স্বরে বলল, 'দোস্ত, তোর মনে যদি কখনও কোন কারণে আঘাত দিয়ে থাকি, মাফ করে দিস। কিছু মনে রাখিস না।'

ভীষণ অবাক হলাম। এরকম একটা মুহূর্তে ও হঠাৎ এরকম কোন কথা বলতে পারে চিন্তাই করিনি। ওর পাশে যেয়ে বসলাম। বললাম, 'তোর কী হয়েছে বল তো? আসার পর থেকেই তোকে বিষণ্ণ দেখছি। আবার এখন এরকম একটা কথা বললি?'

'না। এমনিতেই···হঠাৎ ইচ্ছা হলো।'

'তোর ওপর আমার কোন রাগ নেই। সবচেয়ে প্রিয় মানুষদের উপর কখনও রাগ করা যায় না। অভিমান হয় বড়জোর।'

'থ্যাংকস!' মৃদু হাসল হাসান। তারপর সম্ভবত কথা কাটানোর জন্যই বলল, 'আমার কিন্তু একটা বদঅভ্যেস আছে। সকাল ৭টায় আমার এক কাপ চা খেতে হয়। তোদের দারোয়ানকে বলে রাখবি যেন গেট খুলে দেয়।'

আমি বললাম, 'তোকে বাইরে কোথাও যেতে হবে না। রুবা খুব ভোরে ওঠে। ওকে বলে রাখব। যথাসময়ে তোর চা পেয়ে যাবি।'

'তা হলে তো ভালই।' মৃদু হেসে মাথার নীচে হাত রেখে শুয়ে পড়ল।

আমিও আর দেরি করলাম না। ওকে বিদায় জানিয়ে নিজের ঘরের দিকে রওনা হলাম। যাওয়ার সময় গিল্টু মিয়ার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি, ব্যাটা আজ ঠিকঠাক মতই মশারি খাটিয়ে শুয়েছে। এটা ওর অভ্যেসের বাইরে। প্রতিদিনই হয় আমাকে, না হয় রুবাকে চেঁচামেচি করতে হয় ওর মশারি খাটানো নিয়ে। ঘরে ঢুকে রুবার পাশে শুয়ে পড়লাম। ও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হাসানের চায়ের কথা বলে বেডসাইড টেবিলে একটা স্লিপ লিখে রাখলাম।

সকালে রুবার ধাক্কা-ধাক্কিতে ঘুম ভাঙল। তাকিয়ে দেখি ও ফ্যাকাসে মুখে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কোনমতে বলল, হাসান ভাই রুমে নেই। আড়মোড়া

ভেঙে উঠে বসলাম। রুবা বেশিরভাগ সময়ই অযথা ভয় পায়। দড়ি দেখলেই সাপ মনে করা গোত্রের মানুষ ও। কাজেই খুব একটা গুরুত্ব দিলাম না। বললাম, 'আছে হয়তো বাথরুমে। ওর আবার ভোরে ওঠার অভ্যেস আছে।'

'না। আমি পুরো বাড়ি খুঁজে শিওর হয়েই তোমাকে উঠিয়েছি।'

এইবার মনে হলো, ব্যাপারটা সিরিয়াসলি দেখা দরকার।

সকাল ৯টার মধ্যেই নিশ্চিত হলাম, ও যে শুধু আমার বাসায় নেই তাই নয়, বরং এই অ্যাপার্টমেন্টেই নেই। গরু খোঁজা বলতে যা বোঝায় আক্ষরিক অর্থে তাই করলাম। মনে হচ্ছে মানুষটা রাতারাতি হাওয়া হয়ে গেছে। বাড়ির দারোয়ান বলল, সে কাল রাতে অপরিচিত কাউকে বাসায় ঢুকতে দেখেনি। আজ সকালেও কাউকে বেরোতে দেখেনি। পুরো ব্যাপারটাই অদ্ভুত মনে হলো আমার কাছে। ওর হোটেলের নাম্বারে ফোন করে জানলাম, ওখানে একজনই হাসান আছে। তবে সে রুমেই আছে। এই হাসান নয়। তবে কি হাসান কোন কারণে মিথ্যে বলেছে? অপরাধ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে পুলিশের হাত থেকে?

দুপুর ২টার দিকে হয়রান হয়ে বাসায় ফিরলাম। দুশ্চিন্তায় পাগল হওয়ার দশা হয়েছে। একটা মানুষ না বলে-কয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে যেতে পারে, আমার মাথায় আসছে না। পুলিশে খবর দেব কিনা বুঝতে পারছি না। কিন্তু সমস্যা হলো ২৪ ঘণ্টা পার না হলে, পুলিশ কাউকে মিসিং পারসন হিসাবে গণ্য করে না। আর তা ছাড়া পুলিশ এলে আরও ঝামেলায় পড়ব বলে আমার ধারণা। হয়তো আমাদেরকেই উল্টো সন্দেহ করে বসবে।

হাসান নিখোঁজ হওয়ার পর ১০-১২ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। এখনও কোন কিছুর সুরাহা হয়নি। রুবা আমার সামনে শুকনো মুখে বসে আছে। হাসানের ব্রিফকেস লক করা। না হলে ওটা ঘেঁটে দেখা যেত, কিছু পাওয়া যায় কিনা। কিছুই বুঝতে পারছি না কী করব।

হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম সিলেট যাব। এমনও হতে পারে রাতে জরুরি কোন ফোন পেয়ে ওর মাথা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে হুট করে চলে গেছে। অবশ্য যুক্তিটা আমার নিজের কাছেই হাস্যকর মনে হচ্ছে।

আমার সিলেট যাওয়া রুবা কিছুতেই মেনে নিচ্ছে না। ওর ধারণা, ওখানে গেলে আমি আরও বড় কোন ঝামেলায় পড়ব। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করালাম। ঠিক হলো, আমার সিলেট যাওয়ার পর যদি হাসান চলে আসে, তবে রুবা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেবে। আমার শাশুড়ী অর্থাৎ রুবার মাকে বললাম কিছু দিন আমার বাসায় থাকার জন্য। আর দেরি না করে সেদিন রাতের ট্রেনেই সিলেট রওনা হলাম।

পরদিন খুব ভোরবেলায় সিলেটে পৌঁছালাম। হোটেলে আগে থেকেই সিট বুক করা ছিল। ওখানে যেয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট নিলাম। তারপর সকাল ৯ টার দিকে গোসল এবং নাস্তা সেরে বের হলাম।

ঠিক করলাম, প্রথমেই জেলখানায় যেয়ে জেলারের সাথে দেখা করে ওর

বাসার ঠিকানা নেব। ভাগ্য ভাল হলে হয়তো ওর অফিসেই ওকে পেয়ে যেতে পারি। যদিও ভালমতই জানি যে সে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। বুঝলাম যে আমি আসলে নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছি।

অনেক ঝামেলা করে জেলের ভিতরে ঢুকে জেলারের সাথে দেখা করার অনুমতি পেলাম। যদিও পরে মনে হয়েছে যে দেখা না পেলেই ভাল হত। কেন একথা বললাম? বলছি···

জেলার সাহেব আমাকে দেখে বললেন, 'আরে, আপনি! কী খবর?'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'আমাকে চেনেন আপনি?'

এবার উনি বিস্মিত হলেন। তারপর হঠাৎ হেসে ফেললেন। বললেন, 'আমার স্মৃতি শক্তি এতটা খারাপ নয় যে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই আপনাকে ভুলে যাব। আপনি বসুন।'

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। জীবনে এই প্রথম সিলেটে এসেছি। কিন্তু এই ভদ্রলোক তো মনে হচ্ছে আমাকে চেনেন। ব্যাপারটা আসলে কী ঘটছে আমার জানা দরকার। কিন্তু সবকিছু সত্যি বললে তো এই ভদ্রলোক আমাকে পাগল ঠাওরাবেন। চট করে কোন বুদ্ধি বের করা দরকার। বললাম, 'আসলে কিছু মনে করবেন না। আমি সম্প্রতি এক দুর্ঘটনায় আগের কিছু স্মৃতি হারিয়েছি। ডাক্তারের পরামর্শে আমি যেসব জায়গায় গিয়েছি, আবার সেসব জায়গায় যাচ্ছি। যদি ধীরে ধীরে সব মনে পড়ে যায়, এই আশায়।'

'ও···আই সি!' উনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'কীভাবে ঘটেছে দুর্ঘটনা?'

বুকটা ধড়াস করে উঠল। গুছিয়ে মিথ্যা বলা খুব কঠিন কাজ। বিশেষত পুলিশের লোকের সামনে। বললাম, 'কীভাবে ঘটেছে এটাও মনে নেই। তবে যেটুকু শুনেছি তা হলো, অফিস থেকে ট্যুরে যাচ্ছিলাম। পথে গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করে। তাতে আমি মাথায় আঘাত পাই।'

'আমার কথা আপনার মনে নেই, অথচ সিলেটে যে এসেছিলেন সেটা মনে আছে। জেলখানার কথাও মনে আছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত না?'

আমি আবার ভয় পেয়ে গেলাম। উনি কি বুঝে ফেলেছেন যে আমি মিথ্যে কথা বলছি? বললাম, 'আসলে ছাড়া ছাড়া ভাবে কিছু দৃশ্য চোখের সামনে ভাসে। তা থেকেই বাকিটা আন্দাজ করে নেই। আপনার হাতে যদি সময় থাকে তো আমাকে সবকিছু খুলে বলুন, প্লিজ। কোথায় আমাকে দেখেছিলেন, কীভাবে পরিচয় হয়েছিল···সবকিছু। আমার উপকার হবে।'

উনি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, 'চা খাবেন? চা দিতে বলি?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই আর্দালিকে চায়ের অর্ডার দিলেন।

'···আপনি আমার এখানে প্রথম এসেছিলেন একটি লাশ হস্তান্তরের ব্যাপারে আলাপ করতে,' উনি বলতে শুরু করলেন।

'লাশ হস্তান্তর!!!' চেষ্টা করেও বিস্ময় লুকোতে পারলাম না।

'হ্যাঁ···হাসান নামের এক মেডিকেল ছাত্রের লাশ। ছেলেটি তারই এক ক্লাসমেটকে খুন করেছিল। সেজন্য তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। আমাদের জানা মতে ছেলেটির কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না। ফাঁসি কার্যকর করার পর আমরা ঠিক করেছিলাম যে জেলখানার তত্ত্বাবধানেই ওর দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা হবে। ঠিক এরকম সময়ে আপনি আমাদের এখানে এলেন। লাশের দায়িত্ব নিতে চাইলেন। আমাদেরকে একটি ছবি দেখিয়ে প্রমাণ করলেন যে ওই ছেলেটি আপনার কলেজ জীবনের বন্ধু ছিল। আমরাও আপত্তি করার কোন কারণ দেখলাম না। তারপর আপনি লাশ নিয়ে চলে গেলেন। ওর জিনিসপত্র এবং কিছু ব্যক্তিগত জিনিসও একটা ব্রিফকেসে ভরে আপনাকেই দেয়া হয়েছিল। ঘটনা এই পর্যন্তই।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে, উনি তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে। 'কিছু মনে পড়েছে?'

হঠাৎ বুঝতে পারলাম, ভয়ে আমি ঘেমে উঠেছি। ভয়ংকর এক সম্ভাবনার কথা উঁকি দিচ্ছে মনে। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই ছবিটা কি আপনার কাছে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। প্রমাণস্বরূপ রেখে দিয়েছি। দেখতে চান?'

গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছিল না। মাথা ঝাঁকালাম।

উনি আর্দালিকে দিয়ে একটি ফাইল আনালেন। সেই ফাইল থেকে একটা ছবি বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। ছবিটার দিকে তাকিয়ে আমি বরফের মত জমে গেলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। এটা আমারই কলেজ লাইফে তোলা পিকনিকের একটা গ্রুপ ছবি।

জেলার সাহেব বললেন, 'একেবারে বাম থেকে দ্বিতীয় ছেলেটিই আপনার বন্ধু হাসান। যার ফাঁসি হয়েছে। চিনতে পারছেন?'

আমি কোন কথা বললাম না। চিনতে না পারার কোন কারণ নেই। সেই হাসান, যে পরশু রাতেই আমার বাসায় আমার সাথে গল্প করেছে। যার সাথে স্কুল এবং কলেজ জীবনের এতগুলো বছর পার করেছি। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি নিশ্চিত যে এই ছেলেরই ফাঁসি হয়েছে?' বলেই অবশ্য বুঝলাম, প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে গেল।

আমার কথায় উনি হাসলেন। বললেন, আমাদের এই জেলখানাতেই ফাঁসি হয়েছে আর আমরা জানব না? বুঝতে পারছি, আপনি আসলে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছেন না। কিন্তু কী করবেন বলুন, ভাগ্যের উপর তো কারও হাত নেই।'

ঢাকায় ফিরলাম গায়ে একশো তিন জ্বর নিয়ে। রুবা আমার অবস্থা দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে গেল। পুরো দুটো দিন জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ ছিলাম। তিনদিনের দিন থেকে জ্বর নামতে আরম্ভ করল। রুবার সেবা শুশ্রূষায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম। কিন্তু সেই বিভীষিকার কথা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। রুবাকে অবশ্য সিলেটের ঘটনা কিছুই বলিনি। জানতে চেয়েছিল, শুধু বলেছি যে ওকে খুঁজে পাইনি।

প্রায় মাসখানেক পরের কথা। রুবা কিছু কেনাকাটার জন্য গিল্টুকে নিয়ে বাইরে গেছে। হাসানের ব্রিফকেসটা ওরকমই খাটের নীচে পড়ে আছে। আস্তে করে ওটা টেনে বের করলাম। তারপর প্লায়ার্স আর স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে অনেকক্ষণ চেষ্টার পর লক ভেঙে ফেললাম। ভিতরে ওর কিছু কাপড়-চোপড়, একটা নোটবুক, হাতঘড়ি, দামী কিছু বিদেশী কলম আর মেডিকেল কলেজের কিছু কাগজপত্র রয়েছে। নোট বুক ভর্তি ছোট ছোট কবিতা লেখা। সবগুলোই পিয়াল নামের এক মেয়েকে উৎসর্গ করা হয়েছে। সবশেষে একটি ছবি…একটি মেয়ের ছবি। অপূর্ব সুন্দর একটি মায়াবী মুখ। এত সুন্দর যে শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। ছবিটার অপর পৃষ্ঠায় লেখা 'পিয়াল'। আজ থেকে চার মাস আগের একটা তারিখ লেখা। আর সব শেষে ইংরেজিতে লেখা, I love you, Pial। ছবিটি সোজা করে তাকিয়ে থাকলাম, অপূর্ব সুন্দর মুখটির দিকে। হঠাৎ ছবিটি জীবন্ত মনে হলো। মনে হলো, মেয়েটি কিছু বলতে চায়। কিন্তু কোন এক অজানা কারণে কিছু বলছে না।

